ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ আহরণ, স্বশাসন ও উন্নয়ন

তৃণমূল জনসংগঠন লোককেন্দ্র এবং এসপিইডি পরিচালিত
একটি কর্ম-গবেষণাপত্র

জুন ২০১৬

প্রকাশনা

সোসাইটি ফর পার্টিসিপেটরী এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এসপিইডি)
বাড়ি# ৭৫, রোড# ৬, ব্লক-'বি', মনসুরাবাদ আ/এ, আদাবর,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭.
ফোন: ০২-৮১৯০৩৮৬
ই-মেইল: spedrrtc@gmail.com স্কাইপি: spedrrtc
ওয়েবসাইট: www.sped.org.bd
ফেইসবুক: www.facebook.com/sped.reflect

সম্পাদনা

মোঃ ফজলুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, এসপিইডি

প্রকাশনা সহযোগী

একশনএইড বাংলাদেশ

ডিজাইন ও কারিগরী সহায়তা

রিফ্লেক্ট প্র্যাকটিশনারস ফোরাম অব বাংলাদেশ (আরপিএফবি)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

তৃণমূল জনসংগঠন-লোককেন্দ্র
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট বিষয়ক সংসদীয় ককাস
সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN # 978-984-34-1136-5

এই প্রকাশনাটি যে কোন অবাণিজ্যিক কাজে যে কোন মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

ভূমিকা

'বাজেট ও কর সুশাসন চাই' এই স্লোগানটিকে সামনে রেখে সোসাইটি ফর পার্টিসিপেটরী এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এসপিইডি), একশনএইড বাংলাদেশ এর সহায়তায় 'ফিসক্যাল গর্ভন্যান্স' (বাজেট ও কর সুশাসন) ক্যাম্পেইন করছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণ এ প্রকল্পের মূল অংশগ্রহণকারী। এসপিইডি তৃণমূল জনসংগঠন (লোককেন্দ্র)-এর সাথে ইউনিয়ন পরিষদকে ঘিরে বেশ কিছু কাজ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কর অনাদায়কৃত খাত চিহ্নিতকরণ; ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব সম্পদ আহরণ, স্বশাসন ও উন্নয়ন; বাজেট ও কর বিষয়ক এ্যাডভোকেসী ও ক্যাম্পেইন। সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে জনগণের সবচেয়ে নিকটতম, কার্যকরী এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানটির স্থানীয় জনসাধারণের উন্নয়ন চাহিদা অনুযায়ী কাঙ্খিত সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে প্রতিষ্ঠানিক, স্থানীয় এবং আইনগত নানা সীমাবদ্ধতা। এতে স্থানীয় সরকার নিজস্ব প্রশাসনিক এলাকায় সঠিকভাবে রাজস্ব আদায় করতে পারে না। ফলে, দিন শেষে ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্বভাবে সম্পদ আহরণের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা থেকে যদি কাংখিত সম্পদ আহরিত হয় এবং তা ন্যায্য হিস্যার অংশ হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয়া হয় তাহলে এ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সরকাররের উপর এতটা নির্ভরশীর হয়ে থাকতে হতো না এবং তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে অনেক অবদান রাখতে পারতো।

এসপিইডি উক্ত বিষয়গুলিকে সামনে রেখে তৃণমূল মানুষের মতামত, পরামর্শ ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত 'ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ আহরণ, স্বশাসন ও উন্নয়ন' বিষয়ক একটি নীতি আলোচনাপত্র তৈরি করেছে। যার উদ্দেশ্য হলো- ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব (নিজস্ব আয়) আহরণের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক বিচার ও ইউনিয়ন পরিষদকে আর্থিকভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন করার কৌশল খুঁজে বের করা।

এসপিইডি, 'গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন', 'বাজেট বিষয়ক সংসদীয় ককাস' এবং 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি' কর্তৃক আয়োজিত 'জন-বাজেট সম্মেলন ২০১৬'-তে বিষয়টি উপস্থাপনের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে উক্ত নীতি আলোচনাপত্রে তৃণমূলের মতামত ও পরামর্শের সাথে সুশীল সমাজের ধারণা, মতামত ও পরামর্শ সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে গত ২৫ এপ্রিল ২০১৬ 'উন্নয়ন অধ্যায়ন বিভাগ, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পরামর্শ কর্মশালার আয়োজন করেছিল; যেখানে শিক্ষাবিদ, গবেষক ও নীতি বিশ্লেষকগণ, উন্নয়ন সংগঠনের প্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি, জনসংগঠন (লোককেন্দ্র) এর প্রতিনিধিসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে ২১ মে ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত 'জন-বাজেট সংসদ ২০১৬' তে সহ-অধিবেশন হিসেবে 'ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ আহরণ, স্বশাসন ও উন্নয়ন' বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা ঘোষণা ২০১৬-এর মাধ্যমে জনসাধারণের পরিকল্পনা ও বাজেট বিষয়ক দাবিনামা মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের কাছে তুলে দেয়া যাতে ককাস সদস্যবৃন্দ বাজেট অধিবেশনে উত্থাপিত দাবিগুলো পেশ করতে পারেন।

১. সূচনা ও প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের যে কাঠামো ও প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তার সূচনা মূলতঃ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে। সে সময়কালে প্রণীত কিছু আইনই বর্তমান স্থানীয় সরকার কাঠামোর ভিত্তি। তবে বৃটিশদের আগমণের পূর্বেও এই ভুখন্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম'-এর উপস্থিতি ছিল। এগুলিকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভ্রূণও বলা যেতে পারে। কোন কোন গবেষক এ ধরণের ব্যবস্থাকে 'গ্রাম প্রজাতন্ত্র (Village Republic)' হিসেবেও অভিহিত করেছেন। এই ব্যবস্থা বহুকাল টিকে ছিল বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পত্তন ঘটে বৃটিশ শাসনামলে। ১৮৭০ সালে Village Chaukidari Act ও পরবর্তীতে Bengal Local Self-government Act of 1885 -এর মাধ্যমে আধুনিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে।

ইউনিয়ন পরিষদ হলো সবচেয়ে পূরাতন স্থানীয় সরকার কাঠামো। জনসাধারণের সবচেয়ে কাছের সরকার। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগই কোন না কোন ভাবে এই সরকারের অধীন। কিন্তু নানা কারণে এই প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক চাপ ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা এর মধ্যে অন্যতম কারণ। বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক সীমাবদ্ধতা এটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধস্তন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমিত। 'ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯' এবং 'আদর্শ কর তফশিল-২০১৩' অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণত ইমারত/ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর, ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার ওপর কর; সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী (চিত্তবিনোদন) কর; লাইসেন্স এবং পারমিট ফি; হাট বাজার ও ফেরিঘাট ইজারা; সীমানার মধ্যে হস্তান্তরিত জলমহাল, পাথরমহাল, বালুমহলের আয়ের সরকার নির্ধারিত অংশ; স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ আয়ের অংশ; নিকাহ নিবন্ধন ফি; ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত আয়ের অংশ; বিজ্ঞাপনের উপর কর; পশু জবাইয়ের কর; টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, কিন্ডার গার্টেন, বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট ইত্যাদি উৎস থেকে নবায়ন ও নিবন্ধন ফি রাজস্ব আদায় করতে পারে। এছাড়াও সরকার থেকে ইউনিয়ন পরিষদ দুঃস্থদের সহায়তার জন্য গম ও চাল এবং বিভিন্ন খাত অনুযায়ী অর্থ পেয়ে থাকে। বেতন, সম্মানী এবং উৎসব ভাতা; ভূমি হস্তান্তর করের ১%; এডিপি; টিআর এবং কাবিখা থেকে প্রাপ্ত গম ও চাল দিয়ে মূলত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা হয়। সরকারিভাবে নির্ধারিত চারটি খাতে এডিপি'র অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়: যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়ন। উল্লিখিত বরাদ্দসমূহ ছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডি'র মতো অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কঠিন-কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়। স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদা ভিন্ন হলেও প্রাপ্ত অর্থ সেই চাহিদা পূরণে ব্যয় করা যায় না। অন্যদিকে পরিষদের নিজস্ব আয় এতোই অল্প যে, তা দিয়ে স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। আলোচ্য গবেষণায় ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের একটি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় 'আদর্শ কর তফশিল-২০১৩' অনুসারে যে সকল খাত থেকে স্থানীয়ভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করে এবং যেসব খাত থেকে রাজস্ব সংগ্রহের কথা বলা থাকলেও তা সংগ্রহ করতে পারে না তার

একটি তুলনামূলক চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। খাতগুলি চিহ্নিতকরণসহ ট্যাক্স এসেসম্যান্ট, ট্যাক্স আহরণ প্রক্রিয়া এবং এর উন্নয়নে কতটুকু অবদান রাখছে তার একটি বিশ্লেষণও উপস্থাপন করা হয়েছে এ গবেষণায়।

১.১ ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় ও আদায় পদ্ধতি

ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎসগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই খাতসমূহ অত্যন্ত সীমিত আকারে আয়ের যোগান দিতে পারে। পরিষদ মাত্র পাঁচটি খাত থেকে রাজস্ব আদায় করতে পারে। সেগুলো হলো: ১) বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের ওপর কর; ২) ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার ওপর কর; ৩) বিনোদন (সিনেমা, যাত্রা) কর; ৪) লাইসেন্স বরাদ্দ ও পারমিটের ওপর কর এবং ৪) হাট-বাজার ও ফেরিঘাট ইজারা। তাছাড়া কর তফসিল- ২০১৩ অনুসারে রাজস্ব আদায়ের এরূপ আরো আরো ছোট-খাটে প্রায় ৭৮টি খাতের কথা বলা আছে। এর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ আদায় করতে পারে এরূপ বেশিরভাগই খাত হলো গ্রামের দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের ছোট ছোট আয়মুলক প্রকল্প থেকে, যেমন: দুগ্ধ খামার, লন্ড্রী, বিউটি পার্লার, যানবাহন, খোয়াড়, দোকান কিংবা ব্যক্তিগত ছোট-খাট পেশা ইত্যাদি। এমনকি চিত্তবিনোদনসহ সম্মানীর উপর থেকে কর আদায়ের কথাও বলা আছে। এসব খাত থেকে ইউনিয়ন পরিষদ কর আদায় করতে গেলে দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকায়নের উপরই হাত পড়ে। কিন্তু বড় বড় যেসব খাত যেমন- ইউনিয়নের অধীন হাট-বাজার, ফেরীঘাট হতে ইজারা লব্ধ অর্থ, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (মাত্র ১% পায় ইউনিয়ন পরিষদ), হস্তান্তরিত জলমহাল, পাথরমহাল, বালুমহাল, ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত আয়ের অংশ ইত্যাদি থেকে যে সব কর আদায় হয় তার বেশির ভাগই অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার তার আইনের বলে নিয়ে যায়। সুতরাং ইউনিয়ন পরিষদ ইচ্ছে করলেও উন্নয়নে আশানুরূপ কাজ করতে পারে না । ফলে স্থানীয় সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে একটি অসন্তোষ সব সময় বিরাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত বড় বড় খাত থেকে আয় নিয়ে যাচ্ছে, তার একটি বৃহৎ অংশ যদি ইউনিয়ন পরিষদকে দিতো, তাহলে পরিষদের আয়ের জন্য তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এতো নির্ভরশীল হতে হতো না। পরিষদের লোকজনের বেতন-ভাতা-সম্মানী দিয়েও তারা নিজস্ব উদ্যোগে নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারতো।

উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন পরিষদ উপরোক্ত খাতগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে নানা কারণে আগ্রহও দেখায় না। এর কারণ নানাবিধ; যেমন- প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব ও কোন্দল, কমিশন প্রাপ্তি, অনিয়ম ও দূর্নীতি, কর সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে অসচেতনতা ও অজ্ঞতা কর প্রদানের বিপরীতে সেবা প্রাপ্যতার অপ্রতুলতা, আইনগত বাধা, সরকার থেকে ফলোআপের সীমাবদ্ধতা, নির্বাচনে জনপ্রিয়তা হ্রাসের ও জয় লাভ ব্যাহত হওয়ার ভয়, জনপ্রতিনিধিদের উপর জনগণের আস্থার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্রতা, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব, পর্যাপ্ত মনিটরিংএর অভাব ইত্যাদি।

১.২ তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা কাজটি কোন পেশাদার গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়নি। গবেষণাটি মূলতঃ তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র নারী-পুরুষের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। এই অর্থে এটি একটি 'পার্টিসিপেটরী এ্যাকশন রিসার্চ'-এর ফলাফল। সোসাইটি ফর পার্টিসিপেটরী এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এসপিইডি) তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র নারী-পুরুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নানা ধরণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সারা দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ৭২টি জনসংগঠন এ কাজের সাথে যুক্ত। কর্মসূচিসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমুলক কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি করা। আলোচ্য গবেষণায় ইউনিয়ন পরিষদের আয়, ব্যয় ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং এর লক্ষ্যে দেশের ১৫ উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদকে *(তালিকার জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট-ক)* বেছে নেয়া হয়।

এই গবেষণা কাজের জন্য প্রাইমারী (primary) এবং সেকেণ্ডারী (secondary) উভয় উৎস থেকেই তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সেগুলিকে বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। তৃণমূল জনসংগঠনের প্রতিনিধিরাই মাঠ পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। জনসংগঠনের সদস্যরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে (technique) 'প্রাথমিক উৎস' হিসেবে স্থানীয় পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। এ কাজে সর্বমোট ৮১৩০ জন নারী-পুরুষ অংশ নেয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ৪৫৩০ জন নারী (৫৫.৭%) অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ

১) ট্যাক্স তফসিল বিশ্লেষণ: অংশগ্রহণকারী নিজেরা প্রথমে বিদ্যমান ট্যাক্স তফসিল- ২০১৩ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং পরবর্তীতে স্ব স্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

২) ওয়ার্ড সভা: জনসংগঠনের নারী-পুরুষ সদস্যগণ ওয়ার্ড সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ওয়ার্ডবাসীদের উন্নয়ন চাহিদা, আয়ের উৎস ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

৩) উন্মুক্ত বাজেট সভা: ইউনিয়নের উন্মুক্ত বাজেট সভায় অংশগ্রহণ ও তথ্য-উপাত্ত-মতামত সংগ্রহ।

৪) ওয়ার্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা: বছর শেষে ওয়ার্ডের বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সংখ্যাগত উপাত্ত ছাড়াও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও এলাকার জনসাধারণের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা, মাঠ পরিদর্শনের ভেতর দিয়েও উল্লেখিত বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া সেকেন্ডারি তথ্য হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, প্রোগ্রাম ভিত্তিক প্রতিবেদন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ধারণাপত্র, আইন-বিধিবিধান ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে প্রদান ও এ বিষয়ে পরিষদের সাথে সংলাপ করে তাদের মতামতও সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব আয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা

ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অতি পুরনো প্রতিষ্ঠান। প্রাচীনকালে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় বৃটিশ আমলে ১৮৭০ সালে রাজনৈতিক ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য ৩ বছর মেয়াদি ৫ সদস্য বিশিষ্ট চকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যাত্রা শুরু করে। এরপর ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত আইন এর মাধ্যমে ২ বছর মেয়াদি ৫-৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় গ্রামীন স্বায়ত্বশাসিত আইন এর মাধ্যমে ৬-৯ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করে ১০-১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে ত্রান ও পুর্নবাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৭২ সালে ১০-১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন পঞ্চায়েত দায়িত্ব পালন করে। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে ১১ জন সদস্য নিয়ে ৩ বছর মেয়াদি ইউনিয়ন পরিষদের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ জারি করে ৫ বছর মেয়াদি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে ৬০ অনুচ্ছেদে করারোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও তহবিল রক্ষনাবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯-এ এবিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। কার্যতঃ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ এলাকায় সুশাসন বা মানুষের অধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাসহ জীবনের মান উন্নয়ন, মানবাধিকার সংরক্ষণ, প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল সহায়তা সরাসরি গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছায়।

২.১ রাজস্ব আহরণ পদ্ধতি ও আইনী বিধানসমূহ

ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, ফি, রেট ও টোল ইত্যাদি ইউনিয়ন পরিষদ কমিশন ভিত্তিক এক বা একাধিক আদায়কারীর মাধ্যমে স্থানীয় উৎস হতে আদায় করে থাকে। এজন্য প্রতি আদায়কারীকে ১৫% হারে কমিশন প্রদান করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম পুলিশ এবং ইউপি সদস্যদের মাধ্যমেও আদায় করা হয়। সেক্ষেত্রে গ্রাম পুলিশ নির্ধারিত হারে কমিশন পেয়ে থাকে। অন্যদিকে হাট-বাজার, ফেরীঘাট, জলমহল সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ কর্তৃক প্রতি বছর লীজ দেয়ার পর ইজারার টাকার অংশ বিধান মোতাবেক, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের অনুকুলে জমা প্রদান করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের দাবিযোগ্য কর, রেট, টোল ও অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত দায়-দেনা সরকারী দাবি হিসেবে আদায়যোগ্য। ক্ষমতাপ্রাপ্ত সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর, ফি, রেট টোল দায়-দেনা আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকারী পাওনা আদায় আইন ১৯১৩ (পিডিআর এ্যাক্ট ১৯১৩) এর পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার জন্য রিকুইজিশন প্রদান করে। এটি সার্টিফিকেট দাবীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও পরিক্ষিত হতে হয়। সার্টিফিকেট উপরোক্ত মতে দাখিল হওয়ার পর সার্টিফিকেট অফিসার নির্ধারিত ফরমে ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে খাত এর উপর নোটিশ জারি করেন এবং টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ-১৯৮৩, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক 'আদর্শ কর তফসিল ২০০৩' এবং সরকারের বিভিন্ন পরিপত্র ও নির্দেশনা স্থানীয় সম্পদ আহরণে আইনের উৎস (এস, আর, ও নং ৩৩২-আইন/২০০৩-The Local Government (Union Parishads Ordinance ১৯৮৩ এর section ৫৫) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ আদর্শ কর তফসিল প্রণয়ন এবং ০১/০১/২০০৪ তারিখ থেকে বলবৎ করেছে যা বর্তমানে কার্যকর আছে। কর আদায় স্থগিত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কারো পক্ষে কর প্রদান কষ্টকর বিবেচিত হলে Union Council (Taxation) Rules 1960 এর ১১ ধারার বিধান মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ কর, ফি, রেট ও টোল আদায় ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত স্থগিত করতে পারেন। আবার উক্ত Rules 1960 এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক কর প্রদান করতে পারেননি, এমন ক্ষেত্রে বকেয়া একটি তালিকা তৈরি করে ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে সংশ্লিষ্টদের অবগতির জন্য প্রদর্শন করতে পারেন এবং প্রদর্শনের তারিখ থেকে ১৫ দিন অতিবাহিত হবে, ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত অনাদায়ি বকেয়া কর সরকারী দাবী হিসেবে গণ্য করে সংশ্লিষ্টদের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে কর আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

২.২ কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি এখনো পরিপূর্ণ স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিনত হতে পারেনি। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রবণতাই এর পেছনে মুল কারণ। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক দিক দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবাহি।

সংসদসদস্যদের আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক অনুমোদন ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কোন কাজই করতে পারে না। সংসদসদস্যগণই তাদের স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের সর্বশেষ একক সিদ্ধান্ত দাতা। বস্তুতপক্ষে বর্তমানে অনেক ইউনিয়নেই কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের সমান্তরালভাবে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের নিয়ে 'এমপি সরকার' বিদ্যমান। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক নয়। অনেক অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পই এখন বাস্তবায়িত হয় সংসদসদস্যদের দলীয় কর্মীদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। যেখানে নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধিরা পালন করেন মূলত দর্শকের ভূমিকা। অনেক গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে যথেচ্ছাচার বিরাজমান। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, আমাদের মাননীয় সংসদসদস্যগণ 'গম সংস্কৃতি'তে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। এ সংস্কৃতি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে মারাত্মকভাবে। সর্বোপরি স্থানীয় পর্যায়ে এমপিদের সক্রিয় ভূমিকা আমাদের বর্তমান দুর্বল স্থানীয় সরকার পদ্ধতিকে আরো দুর্বল করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে এমপিদের ক্ষমতায়ন মানে নির্বাচিত চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ক্ষমতার সংকোচন।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আইন, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, কর তফসিল, নির্দেশনা ইত্যাদিও ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যত: কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী করে রেখেছে। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর অনেক আইন বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত করে। আবার স্থানীয় সরকার অর্থাৎ জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ ভিন্ন ভিন্ন আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়া; ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা ভেদে প্রশাসনিক কাঠামো এবং স্থানীয় সরকারের

আসন সংখ্যা একই রকম হওয়া; ট্যাক্স শেয়ারিং (স্থানীয় সরকার কর্তৃক আহরিত কর কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে কতটা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার আলোকে) নীতিমালা অনুসরণ না করে কাজ করা; ইউনিয়ন পরিষদের যে কর সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও ট্যাক্স পলিসি রয়েছে তার সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কর সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মিল না থাকার বিষয়গুলিও রয়েছে। মূলত: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণলয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এখান থেকেই প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে ইউনিয়র পরিষদের আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমিত হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্রীয় সরকারে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। একটি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় কর-আয়ের লাভজনক (lucrative) খাতগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন। মূলতঃ কর, ভ্যাট, কাস্ট ও এক্সসাইজ ডিউটিসহ অন্যান্য আয়ের উৎসগুলি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এসব বড় বড় উৎস থেকে আয় সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে চলে যায়। জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে এই অর্থের সামান্য অংশই স্থানীয় সরকারগুলিতে দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার মূলতঃ ১) অনুদান ও ২) প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই সামান্য অর্থ হস্তান্তর করে থাকে। বহু বছর থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ২-৩% স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় বহু উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু এই সব প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয় কেন্দ্রীয়ভাইে। এতে স্থানীয় সরকারের কোন ভূমিকা নেই। কেন্দ্রীয়ভাবে ২০০৫ সালে ১১টি ইউনিয়ন পরিষদের ওপর পিপিআরসি পরিচালিত একটি সমীক্ষায় নিম্নলিখিত চিত্র ফুটে ওঠে।

সারণী- ১: ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক বাস্তবতা: ২০০৪-০৫ সাল

স্থানীয় সরকার অর্থায়ন	প্রতি ইউনিয়নে গড় পরিমান (টাকায়)
আর্থিক হস্থান্তর অনুদান (এডিপি+বিজি) কেন্দ্রীয় করের ভাগ	৬৩২,৭০০ ৪৬৩,৯৭৮ ১৬৮,৭২২
উন্নয়ন খরচ	৮৭৯,১০৩
নিজস্ব অর্থায়ন	১৬০,১০৮

উৎস: পিপিআরসি সার্ভে অন ইউপি ব্লক গ্রান্ট এসেসমেন্ট, ২০০৬: ইনফরমেশন অন ১১ ইউপি'স

৩. ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব এবং উন্নয়ন কার্যক্রম : ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের ওপর ৪৮টি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১০টি বাধ্যতামূলক। এ কাজগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাজেরই মতো। এগুলো সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকারের হাতে পর্যাপ্ত সম্পদ দেয়া হয় না। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিগণ প্রায়ই কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সম্পদের মধ্যে বিভাজন টেনে স্থানীয় সরকারকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে অকার্যকর বলে দোষারোপ করে থাকেন। একথা সত্য যে, চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ কর আদায় করতে তেমন আগ্রহী নন। কারণ তারা মনে করেন, কর আদায় করলে তাদের জনপ্রিয়তা কমে যাবে। যা অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক নয়। তবে এই অবস্থায় যে কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি এমনটাই করবেন। এছাড়াও এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, কর দেয়ার মতো ধনী মানুষের সংখ্যা গ্রামে কম। ফলে 'ট্যাক্স বেইস' (tax base) অত্যন্ত সীমিত। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সরকারের সম্পদের

বিভাজন অযৌক্তিক। কারণ সকল সম্পদই জনগণের এবং তা তাদের কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। 'প্রিন্সিপ্‌ল অব প্রক্সিমিটি' (principle of proximity) সূত্র মতে, সম্পদ যত মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে তত তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে যোগসূত্র। তাদের কাজকর্মে ও সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হতে পারে, তেমনি অন্যদিকে তৃণমূল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। তাই ইউনিয়ন পরিষদ তথা স্থানীয় সরকারের হাতে আরো দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ দিলে এবং আইনগতভাবে এ প্রতিষ্ঠানকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করলে আমাদের সীমিত সম্পদ আরো ফলপ্রসূভাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে আমাদের জাতীয় জীবনে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা যায় সচরাচর একটি ইউনিয়নের বাজেটের ২০-২৫ শতাংশ ব্যয় হয় বেতন ও সম্মানী ভাতায়, ৬৫-৭০ শতাংশ খরচ হয় অবকাঠামো উন্নয়নে এবং অবশিষ্ট ১০-১৫ শতাংশ মানব সম্পদ উন্নয়ন, অফিস ব্যবস্থাপনা ও দুঃস্থদের সহায়তায় ব্যয় করা হয়।

ঐতিহাসিকভাবে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অতীতে এসব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কাজ ছিল নিরাপত্তা বিধান, রাস্তা ও পুল/কালভার্ড তৈরী, স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান, দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্কুল সংরক্ষণ, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং জেলা বোর্ডকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা। গ্রাম চৌকিদারী আইন-১৮৭০, জনপ্রতিনিধিত্বের প্রথম আইন ঃ বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন-১৮৮৫-এগুলিতে উন্নয়ন কাজ বলতে সুনির্দিষ্ট কোন কাজ ছিল না, তবে রাস্তা তৈরী, জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাদি তদারকই ছিল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন-১৯১৯ এ প্রধান কাজ ছিল নিরাপত্তা বিধান, রাস্তা ও পুল/কালভার্ড তৈরী, স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান, দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্কুল সংরক্ষণ, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং জেলা বোর্ডকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৫৯: কাউন্সিলকে ৩৭টি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়, এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, কৃষি উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, শিক্ষা, যোগাযোগ এবং সমাজকল্যাণ। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার: ১৯৭১, ১৯৭২-১৯৭৫, ১৯৭৬-১৯৮২, ১৯৮২-১৯৯০, ১৯৮৩ সালে ইস্যুকৃত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে তিন ধরণের স্থানীয় সরকার গঠনের বিধান রাখা হয়, যথা-ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। এসময় ১০টি বাধ্যতামূলক কাজ এবং ৩৮টি ঐচ্ছিক কাজের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ আইন-২০০৯, এর আইনে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ১৯৮৩ সালের আইনে উল্লেখিত ১০টি বাধ্যতামূলক কাজ এবং ৩৮টি ঐচ্ছিক কাজের বিভাজন বিলোপ করা হয়েছে। এর পরিবর্তে চার ধরনের ৪৮টি কাজ উল্লেখ করা হয়। যা বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে *(পরিশিষ্ট-খ দেখুন)*।

৩.১ ইউনিয়ন পরিষদের আয় ও রাজস্ব সংগ্রহে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা

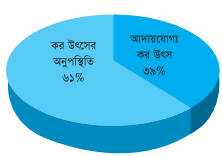
ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক আয়ের উৎস মূলত ৩টি; ১) রাজস্ব আয় ২) সরকারি অনুদান ও ৩) অন্যান্য উৎস থেকে আয়। স্থানীয় সরকার আইন (ইউনিয়ন পরিষদ) ২০০৯ এর ধারা ৬৫ ও ৪র্থ তফসিল অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকে রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ১৩টি বিষয়ের ওপর কর, রেইট, ফি ইত্যাদি আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে *(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট-খ)*। আইনের ধারা-৬৮ (১) এ নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করতে পারে। কর আদায়কারীকে ১৫% হারে কমিশন

প্রদানের মাধ্যমে এবং অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম পুলিশ এবং ইউপি সদস্যদের মাধ্যমেও আদায় করা হয়। সেক্ষেত্রে গ্রাম পুলিশ নির্ধারিত হারে কমিশন পেয়ে থাকে। বকেয়া কর পাওনা আদায় আইন ১৯১৩ (পিডিআর এ্যাক্ট ১৯১৩) এর পদ্ধতি অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট সার্টিফিকেট মামালা রুজু করার মাধ্যমে নোটিশ জারি করে টাকা আদয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব কর সংগহ করেন। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ আইন-২০০৯ এর ৪৫ (১) ধারা অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদে 'কর নিরূপণ ও আদায়' কমিটি স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহে ভূমিকা রাখে। ট্যাক্স পরিশোধের জন্য প্রত্যেক ট্যাক্স প্রদানকারীকে একটি পাসবই সরবরাহ করার কথা বলা আছে। কর, রেট, ফি ইত্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য। ইউনিয়ন পরিষদ কোন কর দাতাকে ৪ কিস্তিতে কর প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করতে পারে এবং প্রত্যেক কিস্তি পরিশোধের তারিখ ও টাকার পরিমান উল্লেখ করে কর পরিশোধের চাহিদাপত্রের বিল/দাবিনামা পাঠাতে পারে। কর আদায়ের রশিদে চেয়ারম্যান ও আদায়কারীর স্বাক্ষরসহ টাকা আদায়ের পরিমান উল্লেখ থাকে এবং নির্ধারিত ব্যাংকে কর পরিশোধ করা হলে, ব্যাংক রসিদ প্রদান করে। কোন কর দাতা যদি ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখের আগে দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করে, তবে তাকে ৫% হারে রেয়াত/ রিবেট দেয়া যায়।

৪. ইউনিয়ন পরিষদের আয় : মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা

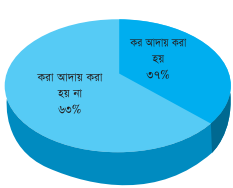
এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য ১৫টি ইউনিয়নের আয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন পরিষদের 'আদর্শ কর তফসিল- ২০১৩' অনুযায়ী সর্বমোট ৭৮টি উৎস থেকে ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্ন ধরণের কর, ফি, টোল, ইজারা ইত্যাদি আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভৌগলিক বাস্তবতার ভিন্নতার কারণে সকল ইউনিয়নে এসব উৎস বিরাজ করে না। এ নিরিখে আলোচ্য ১৫টি ইউনিয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৭৮টি উৎসের মধ্যে মাত্র ৩০টি খাত (৩৯%) থেকে অর্থ আদায় করা সম্ভব। বাকি ৪৮টি (৬১%) খাত থেকে কোন অর্থ আদায় সম্ভব নয় (চিত্র-১)।

চিত্র-১



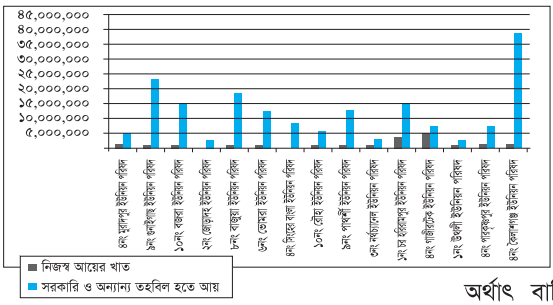
কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, যে ৩০টি সম্ভাব্য উৎস থেকে আলোচ্য ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদ অর্থ আদায় করতে পারে, তার মধ্যে বাস্তবে তারা মাত্র ১১টি (৩৭%) উৎস থেকে অর্থ আদায় করছে। আদায় যোগ্য বাকি ১৯টি (৬৩%) উৎস থেকে কোন অর্থ আদায় করছে না *(চিত্র-২)*। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ অর্থ আদায় না হওয়ার পেছনের নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করেন *(পৃষ্ঠা-১২ দেখুন)*।

চিত্র-২



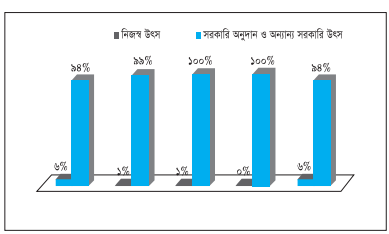
ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস সীমিত হওয়া ও কর আদায়ে অনীহা-অপারগতার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান-সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। চিত্র-৩ এ ১৫ টি ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় ও সরকারি অনুদানের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

চিত্র-৩: ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ ও সরকারী অনুদানের একটি চিত্র



২০১৩-১৪ সালের ৫টি ইউনিয়নের অডিট প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আলোচ্য এই ৫টি ইউনিয়নের গড় নিজস্ব আয় মোট আয়ের শতকরা ৩ ভাগ। অর্থাৎ বাকি শতকরা ৯৭ ভাগই এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। এ থেকে ইউনিয়ন পরিষদগুলির নির্ভরশীলতার মাত্রা অনুমান করা যায় *(চিত্র-৪)*।

চিত্র-৪: ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় ও সরকারি অনুদানের তুলনামূলক হার (অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪)

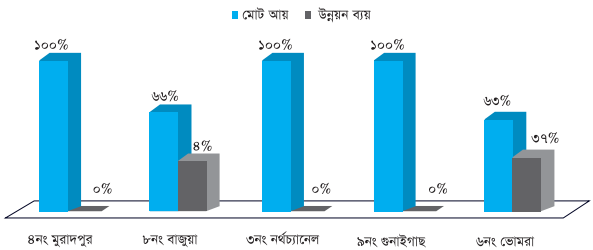


পরিষদের নিজস্ব আয় কম হবার কারণে তার পক্ষে আদতেই নিজস্ব উদ্যোগে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সম্পূর্ণটাই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ও প্রকল্প সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। চিত্র-৫ ও সারণী-২ এ আলোচ্য ৫টি ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো। এ চিত্র থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নিজস্ব আয় থেকে নিজস্ব উদ্যোগে উন্নয়ন ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় না। আলোচ্য ৫টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে শুধুমাত্র ভোমরা ইউনিয়ন পরিষদই উন্নয়নে কিছুটা অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সারণী-২: ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

ইউনিয়ন পরিষদ		সংস্থাপন (বেতন-ভাতা)	বিবিধ খরচ	উন্নয়ন	অন্যান্য (প্রশাসনিক খরচ)	মোট
৪ নং মুরাদপুর	ব্যয়	৪৬৮,৮৬৯	০	০	৩১২,১৮৫	৭৮১,০৫৪
	%	৬০	-	-	৪০	১০০%
৮ নং বাজুয়া	ব্যয়	৩৫৩,০৯১	০	১৮৩,৮৪৫	০	৫৩৬,৯৩৬
	%	৬৬	-	৩৪	-	১০০%
৩ নং নর্থচ্যানেল	ব্যয়	২৫,৮৫১	০	০	৬,৫০০	৩২,৩৫১
	%	৮০	-	-	২০	১০০%
৯ নং গুনাইগাছ	ব্যয়	১১,২১০	০	০	০	১১,২১০
	%	১০০	-	-	-	১০০%
৬নং ভোমরা	ব্যয়	১৯৬,৬৩০	০	২২০,৩৪৫	১৭১,১৪১	৫৮৮,১১৬
	%	৩৩	-	৩৭	২৯	১০০%

চিত্র-৫: নিজস্ব আয় ও উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র



৪.১ স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন চাহিদা ও ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক অবস্থান

ওয়ার্ড সভায় অংশগ্রহণকারী স্থানীয় নাগরিকদের উন্নয়ন চাহিদা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তারা বড় পরিসরে যে সব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের কথা বলে তা হলো: স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন (সাধারণ, পরিবার পরিকল্পনা এবং জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী); অবকাঠামোর উন্নয়ন; শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন; কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন; রাস্তা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ এবং মেরামত; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন; বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন; প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন; বৃদ্ধ ও বিধবাদের উন্নয়ন; নারী ও শিশুর উন্নয়ন; স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রম; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন; সেচ ও খাল; ক্রীড়া উন্নয়ন; গৃহ নির্মাণ ও মেরামত; সামাজিক নিরাপত্তা; দুর্যোগকালিন সময়ে অবস্থার উন্নয়ন; কালভার্ট নির্মান; পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন তৈরি; নারী, শিশু, তরুণ, বৃদ্ধ, কৃষক, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, দলিত, প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান বা উন্নয়ন। এসব চাহিদার নিরিখে ইউনিয়ন পরিষদের কাজগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরিষদও এ ধরণের কাজ করার জন্য দায়বদ্ধ, যেমন :

১. সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচিভুক্ত (যেমন- বয়স্কভাতা, ভর্তুকি, ইত্যাদি) ব্যক্তিদের তালিকা যাচাই করা।

২. জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষতঃ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে সক্রিয় সহযোগিতা করা স্যানিটেশন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান।

৩. ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, রাস্তা আলোকিতকরণ ও অন্যান্য সেবা প্রদানে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ চিহ্নিত করা এবং দূরীকরণের ব্যবস্থা করা।

৪. ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করা।

৫. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করা।

৬. কৃষি, মৎস্য, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, যুব উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।

৭. স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক ও অন্যান্য সমাজগঠনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং সংগঠন তৈরীতে সহায়তা।

৮. মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরী ভিত্তিতে কাজ করা।

অথচ ইউনিয়ন পরিষদের উপর্যুক্ত আয়ের খতিয়ান থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে ঐ সীমিত আয় দিয়ে স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। নিজস্ব আয় বৃদ্ধির পথ সৃষ্টি করতে না পারলে বাস্তবে এটির কোন কার্যকরিতা থাকে না। পরিষদের অডিট প্রতিবেদন বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৫. ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় সংগ্রহে বাধা

সাধারণ পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের দলিলাদি বিশ্লেষণ ও সংগৃহিত মতামত বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত বাধাসমূহ চিহ্নিত করা যায়:

- প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের সীমাবদ্ধতা।
- কর আদায়কারীর রাজনৈতিক নেতা ও প্রভাবশালী দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।
- আদায়ের ১৫% হারে কমিশন পর্যাপ্ত না হওয়ায় আদায়কারীগণ রাজস্ব আদায়ে তেমন আগ্রহী হয় না।
- অনিয়ম ও দূর্নীতি, কর সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে অসচেতনতা এবং কর প্রদানের বিপরীতে সঠিক সেবা না পাওয়া।
- আইনগত বাধা ও সরকার থেকে 'ফলোআপের' সীমাবদ্ধতা।
- আদর্শ কর তফসিল ২০১৩ এর খাত সম্পর্কে মানুষের জানার সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক কোন্দল।
- নির্বাচনে জনপ্রিয়তা হ্রাস ও জয় লাভ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা এবং জনপ্রতিনিধিদের অনীহা।
- জনপ্রতিনিধিদের উপর জনগণের আস্থার অভাব এবং স্থানীয় উন্নয়নে কর প্রদানের প্রতিফলন না থাকা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য, কর আদায় মনিটরিং পদ্ধতি ও কর আদায়ে কার্যকরী দায়িত্ব পালনের অভাব।
- সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীলতা।

৬. কৌশলগত পরামর্শ

- সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের ডিজাইন করার সময় স্থানীয় সরকারকে সাথে নিয়ে ডিজাইন করা এবং প্রকল্পের বিষয়গুলো স্থানীয় সরকারকে খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেয়া।
- গত এক দশক ধরে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সুবিধাবঞ্চিত, দলিত, মৌসুমী পেশাজীবীদের প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানে যে উন্নয়ন বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা বৃদ্ধি করা।
- গ্রামের যুবক-তরুণরা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে আয়ের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখছে তা ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংযুক্ত করা এবং ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তাদের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) এর জন্য আলাদা একটি ফাইনান্স কমিশন গঠন করা যা শুধুমাত্র ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা ও সম্পদের পরিমান বৃদ্ধি এবং আয়ের নতুন পথ সন্ধান করে স্থানীয় সরকারের আয় বৃদ্ধি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ- সুন্দরবন এলাকা থেকে বনবিভাগ তথা কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজস্ব আহরণ করে, কমপক্ষে তার ২৫% অর্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদকে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পরিষদে বাজেট প্রদান করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেটে শিশুদের জন্য আলাদা বাজেটের একটি খাত বরাদ্দ রাখা যা শিশুদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের আরো দক্ষ করার প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা যেমন- প্রশিক্ষণ করানো।
- ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যাদেরকে ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ড প্রদান করার জন্য নির্বাচন করা হয় তাদের নাম, ঠিকানা ইউনিয়ন পরিষদের জনগণ দেখতে পায় এমন স্থানে টাঙিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা। স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কে সম্পৃক্ত করা। স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও স্বচ্ছতার সাথে ইউপি ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করা।

- স্থানীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে কর সংগ্রহ ও জমা দেয়ার ব্যবস্থাসহ করের আওতয়ায় পড়েছে এমন ব্যক্তিদের কর পরিশোধের কাগজপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করা।
- একটি সমন্বিত ট্যাক্স শেয়ারিং ফর্মূলা অনুসরণ করে কর নীতিমালা প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ডের যে ট্যাক্স পলিসি রয়েছে সেখানে এ ট্যাক্স শেয়ারিং বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত করে সে অনুযায়ি আইন প্রণয়ন করা।
- হাট-বাজার, পুকুর, খেয়াঘাট, জলমহল, বালুমহল এসব বড় বড় খাতের ইজারার সমস্ত টাকা যাতে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যয় করতে পারে তার এবং ন্যায্য হিস্যার আয় হিসেবে ভূমি হস্তান্তর ফি ১% এর পরিবর্তে কমপক্ষে ২৫% ইউনিয়ন পরিষদকে দেয়ার ব্যবস্থা করা। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলির মোট লভ্যাংশের ১-২% ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন করা। স্থানীয় সরকার যে কর আদায় করবে তা থেকে ১% কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়ার ক্ষমতা দেয়া।
- স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তা বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ঋণের ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
- দক্ষ কর আদায়কারী নিয়োগ ও মনিটরিং পদ্ধতি জোরদার করা।
- স্থানীয় উন্নয়নের জন্য খাতভিত্তিক বাজেট নির্ধারণ এবং জনগণের চাহিদা আনুসারে সেবা দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী উন্নত সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- স্থানীয় সরকারকে স্থানীয়ভাবে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা, যেমন: স্কুল ভবন নির্মান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মান, ব্রিজ নির্মান, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের পেনশনের অনুমোদন ও প্রদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।
- কর সংগ্রহ বৃদ্ধি ও স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজে তা খরচ করার স্বাধীনতা দেয়া; যেমন-বয়স্ক ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, চিকিৎসা কার্ড, ইন্সুরেন্স, ভিজিডি, ভিজিএফ, রাস্তা মেরামত, নদী ভাঙ্গন রোধ ইত্যাদি।
- স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সংযুক্ত না করে বিয়োজন করে দেয়া এবং এর উপর থেকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক নির্ভরশীলতা হ্রাস ও প্রভাবমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের সংশোধন করা।

- কর প্রদানের সুবিধা ও আইন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা; পাশাপাশি কর প্রদানের পদ্ধতিগত ও আইনগত জটিলতা দূর করা এবং এ সংক্রান্ত নিয়মিত কার্যক্রম হাতে নেয়া। কর আদায় ও এর ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) এর সক্ষমতা ও জনবল বৃদ্ধি করা।
- স্থানীয় সরকার এর বিভিন্ন স্তরে (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ) ভিন্ন ভিন্ন আইন না করে সকল প্রতিষ্ঠানকে একটি মাদার ল' এর আওতায় পরিচালনা করা।
- ভৌগোলিক অবস্থান ও সেবার অবস্থা ভেদে স্থানীয় সরকারের আসন বৃদ্ধি ও হ্রাস করা এবং প্রশাসনকে রিফর্ম বা পুনঃর্গঠন করা। স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রক্রিয়া পার্লামেন্টের নির্বাচনের মত করা। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি প্রশিক্ষিত ও কমপক্ষে 'স্নাতক' পাশ হওয়া।
- স্থানীয় সরকার প্রতিবছর বাজেট অধিবেশনের আগে নিজেরাই একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর কাছে পেশ করা এবং তা জাতীয় বাজেট অধিবেশনে উত্থাপন করা।

উপসংহার

কেন্দ্রীয় সরকার এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন বা মানুষের অধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাসহ জীবনের মান উন্নয়ন, মানবাধিকার সংরক্ষণ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল সহায়তা সরাসরি গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায়। স্থানীয় সম্পদ আহরণের উপর ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারর অনুদানের ওপর নির্ভর না করে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে তাদের নিজেদের স্থানীয় সম্পদ আহরণের জন্য আরো উদ্যোগী এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও বিদ্যমান আইনী কাঠামোতে পরিবর্তন আনা সময়ের দাবি।

পরিশিষ্ট

ক. গবেষণা এলাকা:

৯টি জেলার (নেত্রকোণা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, খুলনা, চট্টগ্রাম ও সাতক্ষীরা) ৯টি উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদ -

১) ১০নং রৌহা ইউনিয়ন পরিষদ, নেত্রকোণা সদর।
২) ৯নং পাথর্শী ইউনয়ন পরিষদ, ইসলামপুর, জামালপুর।
৩) ৩নং নর্থচ্যানেল ইউনিয়ন পরিষদ, ফরিদপুর সদর।
৪) ১নং চর হরিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর।
৫) ৪নং গাজীরটেক ইউনিয়ন পরিষদ, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর।
৬) ১নং উথলী ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
৭) ৪নং পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ, দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা।
৮) ৪নং কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, দাকোপ, খুলনা।
৯) ৪নং মুরাদপুর ইউপি, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১০) ৯নং গুনাইগাছ ইউনিয়ন পরিষদ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
১১) ১০নং বজরা ইউনিয়ন পরিষদ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
১২) ২নং জুয়াদা ইউনিয়ন পরিষদ, হরিনাকুন্ড, ঝিনাইদহ।
১৩) ৮নং বাজুয়া ইউনিয়ন পরিষদ, দাকোপ, খুলনা।
১৪) ৬নং ভোমরা ইউনিয়ন পরিষদ, সাতক্ষীরা সদর।
১৫) ৪নং সিংহের বাংলা ইউনিয়ন পরিষদ, নেত্রকোণা সদর।

খ. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী [বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, অক্টোবর ১৫, ২০০৯ দ্বিতীয় তফসিল (ধারা ৪৭ দ্রষ্টব্য)]

বাধ্যতামূলক কাজ

১. ইউনিয়ন পরিষদের আইন শৃংখলা নিশ্চিত করনে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা এবং রক্ষা করা।
২. অপরাধ, অনিয়ম ও চোরা চালান প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।
৩. কৃষি, বন, মৎস, পশু পালন, শিক্ষা,স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, যোগাযোগ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৪. পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উসাহিত করা।
৫. স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহার।
৬. রাস্তা, খাল, পুল, বাঁধ, টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক লাইন ইত্যাদি সরকারী সম্পদের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা।
৭. ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ড পর্যালোচনা এবং সে সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা।
৮. স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য আলোচনার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরন।
৯. জন্ম, মৃত্যু, অন্ধ, ভিখারী ও দুঃস্থদের নিবন্ধীকরণ।
১০. সব ধরনের জরিপ পরিচালনা করা।

ঐচ্ছিক কার্যাবলী

১. পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী।
২. পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৩. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ।
৪. কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
৫. মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
৬. কর, ফি, টোল, ফিস ইত্যাদি ধার্যকরণ ও আদায়।
৭. পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন।
৮. খেলাধূলা, সামাজিক উন্নতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি কার্যক্রম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান।
৯. পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
১০. আইন শৃংখলা রক্ষায় সরকারের অর্পিত দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
১১. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ।
১২. সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠের হেফাজত করা।
১৩. ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তায় ও সরকারি স্থানে বাতি জ্বালানো।
১৪. বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ চুরি ও ধ্বংস প্রতিরোধ।
১৫. কবরস্থান, শ্মশান, জনসাধারণের সভার স্থান ও অন্যান্য সরকারি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।
১৬. জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে অনধিকার প্রবেশ রোধ এবং এই সব স্থানে উৎপাত ও তাহার কারণ বন্ধ করা।
১৭. জনপথ ও রাজপথের ক্ষতি, বিনষ্ট বা ধ্বংস প্রতিরোধ করা।
১৮. গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
১৯. অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ।
২০. মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ।
২১. ইউনিয়নে নতুন বাড়ি, দালান নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং বিপজ্জনক দালান নিয়ন্ত্রণ।
২২. কূয়া, পানি তোলার কল, জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য উৎসের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।
২৩. খাবার পানির উৎসের দূষণ রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সন্দেহযুক্ত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
২৪. খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল, কাপড় কাঁচা বা পশু গোসল করানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
২৫. পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে শন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
২৬. আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
২৭. আবাসিক এলাকার মাটি খনন করিয়া পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।

২৮. আবাসিক এলাকায় ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
২৯. অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় তৎপরতা গ্রহণ ও সরকারকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান।
৩০. বিধবা, এতিম, গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ ও সাহায্য করা।
৩১. গণশিক্ষা কার্যক্রম, সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান।
৩২. বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩৩. গবাদি পশুর খোঁয়াড় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩৪. প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা।
৩৫. ইউনিয়নের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ বা সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩৬. ই-গভার্ণেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।
৩৭. ইউনিয়ন পরিষদের মত সদৃশ কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ।
৩৮. সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত দায়িত্বাবলী।

গ. তথ্যসূত্র

- *বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক কর আদায়কৃত ও অনাদায়কৃত খাতসমূহ' ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদ'-কে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর সংক্রান্ত ব্রন্নশিউর*
- *ওয়ার্ডসভা, উন্মুক্ত বাজেট সভা ও বাৎসরিক ওয়ার্ড সভার প্রতিবেদন*
- *বাজেট ও কর সুশাসন ও জনঅংশগ্রহণ-তৃণমূলের নীতি-আলোচনা পত্র*
- *বার্ষিক প্রকল্প কর্মসূচি প্রতিবেদন*
- *ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এবং আদর্শ কর তফশিল-২০০৩ ও ২০১৩*
- *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১২), ইউনিয়ন পরিষদ অপারেশনাল ম্যানুয়েল, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়*
- *বদিউল আলম মজুমদার (২০১১) 'ইউনিয়নে প্রকাশ্য বাজেট অধিবেশন: তৃণমূল থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আন্দোলন', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।*
- *১৫টি ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট- ২০১৫-২০১৬*
- *মনোয়ার মোস্তফা ও আসগর আলী সাবরী ২০১২, 'সবার জন্য বাজেট সবাই মিলে বাজেট জাতীয় বাজেটের গণতন্ত্রায়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গ', গণতান্ত্রিক বাজেট* আন্দোলন, ঢাকা।